Ramananda Centenary College Journal of Humanities and Social Sciences
A Peer Reviewed Annual Journal
Volume I, Issue I (April 2018)
Saha, Kailashpati. *"পশ্চিমবঙ্গের আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক অবস্থার প্রেক্ষিতে সমরেশ মজুমদারের উপন্যাস চতুষ্টয়"* **pp 87-96**

পশ্চিমবঙ্গের আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক অবস্থার প্রেক্ষিতে সমরেশ মজুমদারের উপন্যাস চতুষ্টয়

কৈলাশপতি সাহা
সহকারি অধ্যাপক
রামানন্দ সেন্টেনারি কলেজ

স্বাধীনতার তিন বছর আগে ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দে সমরেশ মজুমদারের জন্ম। ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে বাংলা কথাসাহিত্যে গল্পকার রূপে তাঁর আত্মপ্রকাশ। প্রথম উপন্যাস 'দৌড়' (১৯৭৭) – বিষয় ভোগবাদী সভ্যতার অবিরাম অক্লান্ত প্রতিযোগিতার দৌড়। ঘোড়া দৌড়ের মাঠ এখানে প্রতীক। গোটা দুনিয়াটাই যেন রেসের মাঠ। সমাজ পরিবেশকে বড় ক্যানভাসে প্রতীকে, ব্যঞ্জনায় এভাবে জাগিয়ে তোলার মধ্যে নিহিত ছিল সমরেশ মজুমদারের ঔপন্যাসিক প্রতিভার পূর্ণ বিকাশের আভাস। এই আভাস পরিপূর্ণতা পেল তাঁর মহাকাব্যপ্রতিম উপন্যাস চতুষ্টয়ে। স্বাধীন ভারতের আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক অবস্থার প্রেক্ষিতে সংলগ্ন এই উপন্যাসগুলিতে যেমন একটি বিরাট দেশকালের চিত্র আছে, তেমনি আছে মানব সম্পর্কের ঘাত- প্রতিঘাতের অন্তর্নিহিত বয়ান।

খণ্ডিত স্বাধীনতা প্রেক্ষাপটে 'উত্তরাধিকার'(১৯৭৯) উপন্যাসের সূচনা। নায়ক অনিমেষের শৈশব থেকে কৈশোরে পদার্পণ, ডুয়ার্সের নয়নাভিরাম নির্জন পরিবেশে বেড়ে ওঠা এবং পরিবার ও বিদ্যালয় সূত্রে জেগে ওঠা প্রতিবাদী চেতনার প্রবাহ তাকে পরবর্তী বৃহদায়তন কানিনিতে প্রোটাগনিস্ট চরিত্রে পরিণত করেছে। কাকা প্রিয়তোষের কাছে সে প্রথম শোনে- 'এ আজাদী ঝুটা হ্যায়', জানতে পারে কমিউনিস্টদের স্বপ্ন ও সংকল্পের কথা- 'আমরা কম্যুনিস্ট। আমরা চাই দেশে গরিব বড়লোক থাকবে না, সবাই সমান, তাহলে আমরা স্বাধীন হব।' এই চেতনার উত্তরাধিকার নিয়ে তরুণ অনিমেষ এল কলকাতায়। এখান থেকে 'কালবেলা'(১৯৮৩) উপন্যাসের সূচনা। অনিমেষকে স্বাগত জানায় উত্তাল মহানগর তাঁর জঙ্ঘায় বুলেট গেঁথে দিয়ে। এই ক্ষতই হয়ে ওঠে কালের মারণ চিহ্নের প্রতীক। সে এসেছিল উচ্চশিক্ষার জন্য, জড়িয়ে গেল নকশাল আন্দোলনে। কিন্তু অচিরেয় দেখল দল উপদলের কোন্দল, অবিশ্বাস- কাল অবধি যারা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করেছে, হঠাৎ পরিণত হল শ্রেণী শোত্রুতে। আবার নির্বাচনপন্থীদের ভণ্ডামি দেখে অনিমেষের মনে হয়- "তারা জনসাধারণকে বোঝাচ্ছে আমাদের ভোট দিন, আমরা আপনাদের সুখের রাজ্যে নিয়ে যাব . . . এ যেন তিন চারটে সাবানের কোম্পানি দরজায় দরজায় নিজেদের প্রোডাক্টের গুণাগুণ বলে বেড়াচ্ছে বিক্রি বাড়াবার জন্য।" এই সংশয় আর দোলাচলতার মধ্যে অনিমেষের একমাত্র আশ্রয় মাধবীলতা ও তাদের সন্তান অর্ক। সমরেশ মজুমদারের উপন্যাস চতুষ্টয়ের তৃতীয় খণ্ড 'কালপুরুষ'(১৯৮৫)এ স্থান পেয়েছে নির্বচনে জিতে আসা বামপন্থার অবক্ষয় আর সংসদীয় বিপ্লবের স্বপ্নভঙ্গের কাহিনি। এখানে এসে অনিমেষর মনে প্রশ্ন জেগেছে, এই যে হাজার হাজার ছেলে বিপ্লবের আশায় প্রাণ দিল আর অগুনতি মানুষ মানুষ বিকলাঙ্গ হয়ে পড়ে রইল তাতে দেশের কোন পরিবর্তন হয়েছে? 'কালপুরুষ' উপন্যাস প্রকাশের দীর্ঘ পঁচিশ বছর পর 'মৌষলকাল'(২০১৩) উপন্যাসের সূচনা। এই কাহিনিতে স্থান পেয়েছে অনিমেষ ও মাধবীলতার সন্তান অর্কের রাজনৈতিক জীবন। এখন অনিমেষ ও মাধবীলতা বৃদ্ধ। এই উপন্যাসের আধার পশ্চিমবঙ্গের এক উত্তাল রাজনৈতিক সময়। রাজনৈতিক পালাবদলের সেই ইতিহাসের বাঁকে উপস্থিত হয়েছে মধ্যবয়সি অর্ক। প্রতিবাদ, আবেগ ও অস্পষ্ট ভালোবাসায় অর্ক যেন এক অবাধ্য স্বর। স্বাধীনতা পরবর্তী আর্থ- সামাজিক রাজনৈতিক বিবর্তনের ধারায় বামফ্রন্টের অন্তিম লগ্নে এবং তৃণমূলের উত্থান পর্বে পারস্পারিক অবিশ্বাসের দিনগুলিতে পৌঢ় অনিমেষ-মাধবীলতা ঝলসে ওঠে আরো একবার।

সাহিত্য সমাজ নিরপেক্ষ নয়- সাহিত্যের আয়নায় প্রতিফলিত হয় সমকালীন সমাজ, অর্থনীতি, রাজনীতি সবকিছু। তাই প্রতিটি সাহিত্যিক একদিক থেকে সমাজ নির্মানের কারিগর। বাংলা সাহিত্যে সমরেশ মজুমদারের আবির্ভাব সত্তর দশকে। তবে তাঁর রচনার মধ্যে শুধুমাত্র সত্তরের প্রতিচ্ছবি ধরা পড়েনি; বরং স্বাধীনতা পরবর্তী কংগ্রেসি শাসন থেকে শুরু করে উদ্বাস্তু সমস্যা, খাদ্য আন্দোলন, ছাত্র আন্দোলন, যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠন, নকশাল আন্দোলন, বামপন্থার উত্থান, পঞ্চায়েতি রাজনীতি, বিশ্বায়ন ও বিশ্বমন্দা, বামপন্থার পতন ও তৃণমূল সরকারের উত্থান পর্যন্ত এক দীর্ঘ সময়ের রাজনৈতিক ইতিবৃত্ত যেমন ধরা পড়েছে; তেমনি আছে মানব চরিত্রের ঘাত- প্রতিঘাত সমন্বিত নানা মনস্তাত্ত্বিক বিবরণ। আমরা এই আলোচনায় স্বাধীনতা পরবর্তী আর্থ- সামাজিক রাজনৈতিক অবস্থার প্রেক্ষিতে সমরেশ মজুমদারের উপন্যাস চতুষ্টয়ের উপর আলোকপাত করতে পারি।

‘উত্তরাধিকার’ (১৯৭৯), ‘কালবেলা’ (১৯৮৩), ‘কালপুরুষ’ (১৯৮৫) এবং ‘মৌষলকাল’ (২০১৩) এই উপন্যাস চতুষ্টয়ে আছে ১৯৪০ থেকে ২০১১ পর্যন্ত দীর্ঘ সত্তর বছরের আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক ঘটনার বিবরণ, অখণ্ড ভারত থেকে খণ্ড ভারত নির্মানের কাহিনি। স্বাধীনতা, দেশভাগ, উদ্বাস্তু সমস্যা, নানা রাজনৈতিক আন্দোলনের উত্থান পতনের কাহিনি এই চারটি পর্বের কাহিনিতে প্রসারিত। শিশু অনিমেষের বড় হওয়া, গয়েরকাটা চা বাগান ও আংরাভাসা নদীর প্রসঙ্গ, শৈশবের স্কুলে কংগ্রেসি ভাবাপন্ন মাস্টারমশাই এর সান্নিধ্য, স্কুলে পতাকা উত্তোলন, ছোটকাকার কাছে বামপন্থার প্রথম পাঠ, উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য কলকাতায় আগমন, আন্দোলনকারীদের মধ্যে পড়ে পায়ে পুলিশের গুলি খাওয়া, মাধবীলতার সঙ্গে প্রেম, নকশাল আন্দোলনে যোগদান করার অপরাধে জেল হওয়ার সময় তাদের সন্তান অর্কের জন্ম, জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর ঈশ্বরপুকুর লেনের বস্তি বাড়িতে অর্কের সঙ্গে অনিমেষের পরিচয় পর্যন্ত কাহিনি ধরা পড়েছে ‘উত্তরাধিকার’ ও ‘কালবেলা’ উপন্যাসে। এর পরের কাহিনি দুটিতে রয়েছে তাদের সন্তান অর্কের রাজনৈতিক জীবন। বামপন্থী রাজনীতির অবক্ষয়ের পর তৃণমূল সরকারের উত্থান পর্যন্ত দীর্ঘ রাজনৈতিক ঘটনার বিবর্তন। ২০০৬ সালে নির্বাচনে জেতার পর বামফ্রন্টের ভ্রান্ত শিল্পনীতি, জনসাধারণের প্রবল বিরোধিতা, তথাকথিক অনুন্নয়ন এবং অসহযোগিতা, মাওয়িস্ট- কমিউনিস্ট জনযুদ্ধ এবং মাওবাদী কমিউনিস্ট পার্টির গোপন গোষ্ঠী সংগ্রামের কাহিনি স্থান পেয়েছে এই দুটি পর্বে। অর্ক বড় হওয়ার পর সেও বাবার মতো রাজনীতিতে এল- তবে সে ব্যক্তিজীবনকে নয়, গোষ্ঠীজীবনকে বড় করে দেখল। পুলিশ যখন মিথ্যা খুনের অভিযোগে অর্ককে ধরে নিয়ে গেল, তখন বস্তির পঞ্চাশটি পরিবার তার মুক্তির জন্য থানা ঘেরাও করে। জেল হাজতের এপার থেকে মাধবীলতা অর্ককে আশীর্বাদ করল তার সাহসিকতার জন্য।

এক

সমরেশ মজুমদার চা বাগানে তাঁর শৈশবের অভিজ্ঞতার পটভূমিকায় অনিমেষ চরিত্রটিকে গড়ে তুলেছেন। ডুয়ার্সের চা বাগানের মনোমুগ্ধকর দৃশ্য দিয়ে ‘উত্তরাধিকার’ উপন্যাসের সূচনা। ডুয়ার্সের চা বাগানে দীর্ঘ পঁয়তাল্লিশ বছর চাকরি করার পর অনিমেষের দাদু সরিৎশেখর অবসর নিয়েছিলেন ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট। তখন ভারতবর্ষ স্বাধীন হচ্ছে, দেশভাগ হচ্ছে, ব্রিটিশরা দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছে। ভবানী মাস্টার অনিমেষকে স্কুলে যেতে বলে। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট স্কুলে পালিত হয় প্রথম স্বাধীনতা দিবস। স্থানীয়

নেতা হরবিলাসবাবু অনিমেষকে পতাকা তোলার জন্য আহ্বান জানায়। এখানেই অনিমেষের দীক্ষা হয়ে যায় দেশ সেবার মন্ত্রে। হরবিলাশবাবু বললেন-

"আগামীকালের ভারতবর্ষের অন্যতম নাগরিক শ্রীমান অনিমেষ পতাকা তুলছে। দিদিমণি শাঁখে ফুঁ দিলেন। চারধারে হই- চই চিৎকার। সবাই সবাইকে জড়িয়ে ধরছে। স্কুলমাঠ মুখরিত হল 'বন্দেমাতরম' ধ্বনিতে।" [১]

স্কুলের নতুন স্যার অনিমেষকে শিখিয়েছিলেন যে, আমাদের প্রত্যেকের দুজন করে মা আছেন- একজন গর্ভধারিণী আর একজন হলেন দেশমাতা। এই দেশমাতাকে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'বন্দেমাতরম' গানে বন্দনা করেছেন।

অনিমেষের কাকা প্রিয়তোষ মার্ক্সবাদে দীক্ষা নিয়ে বাড়ি ছেড়ে চলে যায়। রাতের অন্ধকারে ছোট্ট অনিমেষের কক্ষে চলে রাজনীতির গোপন অভিসার। চুপিচুপি খাটের তলা থেকে কতগুলি মার্কসবাদী পত্রিকা ও বইপত্র নিয়ে কাকা চলে যান। সেই রাতে ছোটকাকার মুখ থেকে অনিমেষ প্রথম শুনেছিল-

" এ আজাদী ঝুটা হ্যায়। কংগ্রেসীরা বদমাশ। তারা ইংরেজের হাত থেকে স্বাধীনতা ভিক্ষা নিয়েছে। আমরা এ স্বাধীনতা চাই না। কংগ্রেসীদের হাতে সরকার, তাদের পুলিশ আছে, বন্দুক আছে, কিন্তু আমাদের শরীরে রক্ত আছে।" [২]

অনিমেষের মনে ধন্দ। এ স্বাধীনতা কী তবে সত্যি নয়। নতুন স্যারের কথার সঙ্গে কাকার কথার কোন মিল নেই কেন। এসমস্ত ব্যাপার অনিমেষকে বিভ্রান্ত করে দিচ্ছিল। সে রাতেই পুলিশ এল। তাদের কাছে সরিৎশেখর প্রথম জানতে পারলেন তাঁর ছোটছেলে কমিউনিস্ট হয়েছে।

পর পর এই সমস্ত ঘটনা অনিমেষকে বদলে দিচ্ছিল। সমগ্র 'উত্তরাধিকার' উপন্যাস জুড়ে আছে অনিমেষে ধীরে ধীরে বড় হওয়া আর বদলে যাবার কাহিনি। তার বাবার দ্বিতীয় বিবাহ, জলপাইগুড়ি স্কুলের নিত্য নতুন অভিজ্ঞতা, স্বাধীনতার পর সারা দেশে 'এ আজাদী ঝুটা হ্যায়' শ্লোগান, কংগ্রেস আর বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে আদর্শগত ব্যবধান ও সংঘর্ষ মাঝে মাঝে অনিমেষকে বিভ্রান্ত করে দিচ্ছিল। ধীরে ধীরে সে জলপাইগুড়ি শহরটাকে চিনতে শুরু করে। নতুন স্যারের কাছে দেশপ্রেমের পাঠ নেয়, জলপাইগুড়ি জেলার নানা গল্প শোনে।

জলপাইগুড়ি শহরে অনির জন্য অপেক্ষা করেছিল এক বিস্ময়- বহুদিন বাদে তার ছোটকাকা প্রিয়তোষ এল। তার বেশবাস চালচলন অনেকটা বদলে গেছে, বোঝা যায় তার হাতে এখন অনেক টাকা। প্রিয়তোষের পূর্ববর্তী প্রণয়িনী তপুপিসির জলপাইগুড়ি চলে যাবার সংবাদ তার মনে আর ভাবান্তর ঘটায় না। প্রাক্তন কমিউনিস্ট প্রিয়তোষ এখন তেজেনদা ও রমলাদির সহযাত্রী নয়। এইসব রাজনৈতিক উত্তাপ অনিমেষকে বিস্মিত ও আহত করেছিল। অনিমেষকে তার পরিবেশ ও মানুষজন ধীরে ধীরে বদলে দিচ্ছিল। তার ছোটকাকা প্রিয়তোষের ভোলবদল (কমিউনিস্ট পার্টি পরিত্যাগ করে মন্ত্রীর সঙ্গে প্লেনে যাওয়া আসা), নতুন স্যার নিশিথবাবুর ভোলবদল (কংগ্রেসি রাজনীতি ছেড়ে বিরাম করের বাড়িতে নারীসঙ্গ)- এ দুটি ঘটনা অনিমেষের মনে ধাক্কা দিয়েছিল। উত্তরবঙ্গে চা শ্রমিকদের হরতাল ভঙ্গ করার জন্য সুনীলদাকে হত্যা এবং শ্মশানযাত্রীদের সঙ্গে হেঁটে যেতে অনিমেষ বুকের মধ্যে অদ্ভুত শিহরণ অনুভব করে। সুনীলদাকে হত্যার পর স্বর্গছেড়া চা

বাগানে শ্রমিকদের হরতালে নেতৃত্ব দিয়েছিল জুলিয়েন। চা বাগানে হরতাল সফল হওয়ার পর অনিমেষ হাঁটতে হাঁটতে ভাবছিল-

"মহাত্মা গান্ধি, সুভাষচন্দ্র ও কার্ল মার্ক্স- অনিমেষ যেন দুটো হাত দিয়ে এই তিনজনকে ছুঁয়ে দেখতে দেখতে হাঁটছিল। দেশ বড় না দেশের মানুষ বড়।" [৩]

দুই

'উত্তরাধিকার' প্রকাশিত হবার পর রাজনৈতিক এবং অরাজনৈতিক মহলে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। কলকাতায় এসে অনিমেষের প্রতিক্রিয়া জানতে চেয়ে আগ্রহী পাঠক 'দেশ' পত্রিকার সম্পাদক সাগরময় ঘোষকে চিঠি লেখেন। সম্পাদক তখন সমরেশকে দু মাসের মধ্যে অনিমেষের পরিণতি জানতে চেয়ে আর একটি উপন্যাস লিখতে বলেন। এরপর 'কালবেলা' উপন্যাস রচনা প্রসঙ্গে লেখক সমরেশ মজুমদার জানিয়েছেন-

"কালবেলা প্রকাশিত হতে লাগল কয়েক মাস ধরে। উত্তরাধিকার দ্বিতীয় খণ্ড না বলে নতুন নাম দিলাম সময়টাকে ধরব বলে। যারা সিরিয়াস পাঠক তাঁরা নিশ্চয়ই লক্ষ করেছেন দুটো উপন্যাসের সময় নিয়ে একটু গোঁজামিল আছে। নকশাল আন্দোলনের শুরুর সময়টাই পৌঁছতে ওটা না করে উপায় ছিল না।" [৪]

'কালবেলা' উপন্যাসে দেখি কিশোর অনিমেষ এখন পরিণত। জলপাইগুড়ি জেলা স্কুলে পড়া শেষ করার পর উচ্চশিক্ষা লাভের অনিমেষ এসেছিল কলকাতায়। জনহীন শিয়ালদা স্টেশনে নেমে সে পড়ে যায় বাইরের কার্ফু কবলিত এলাকায়। সময়টা ১৯৬০ সাল। খাদ্য আন্দোলনের সময়ে ক্ষিপ্ত জনতা ট্রাম বাস পোড়ানো শুরু করেছিল কলকাতার বুকে। অনিমেষের কিছু বুঝে ওঠার আগে তাকে স্বাগত জানায় উত্তাল মহানগর- তার জঙ্ঘায় বুলেট গেঁথে দিয়ে। কলেজে ভর্তি হওয়া ও হস্টেলে থাকার পর হঠাৎ রটে গেল, অনিমেষ খুব অ্যাকটিভ কমিউনিস্ট- খাদ্য আন্দোলনের সময় সে পুলিশের সঙ্গে লড়াই দিয়েছে। অনিমেষের আপত্তি সত্ত্বেও বামপন্থী ছাত্ররা তাকে হিরো বানিয়ে দিল। অনিমেষ বুঝতে পারল এদের চিন্তা ভাবনা অনেক পরিণত, দল চালানো প্রক্রিয়া অনেক জটিল এবং কমরেডশিপের মধ্যে অনেক বিবেচনা লুকিয়ে আছে। সুভাষদা তাকে বোঝায়-

"আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা এমনভাবে তৈরি হয়েছে যাতে দেশের মেরুদণ্ড ভেঙে যায়।" [৫]

অনিমেষের সঙ্গে আলাপ হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রনেতা বিমানের সঙ্গে। সময়টা ১৯৬৪ সাল। ভারত- চীন যুদ্ধকে কেন্দ্র করে কমিউনিস্ট পার্টি সি পি আই এবং সি পি আই (এম)- এই দুভাগে ভাগ হয়ে যায়। সুবাসদা, বিমান, সুদীপ সি পি আই (এম) এর সদস্য। বিশ্ববিদ্যালয়ের লনে বাম এস এফ আই এর সভা ডাকা হয়। ইচ্ছে না থাকলেও অনিমেষকে সেই সভায় যেতে বাধ্য করা হয়। সভার বক্তা বিমান তাকে হতচকিত করে দিয়ে শ্রোতাদের জানায়-

"বন্ধুগণ, বর্তমান কংগ্রেস সরকার দেশের অর্থনীতি থেকে শিক্ষাব্যবস্থা, সব জায়গায় অরাজকতা সৃষ্টি করতে চান যাতে মানুষের মেরুদণ্ড ভেঙে যায়। ছাত্র পরিষদের বন্ধুরা সেই কাজই করছে। আমি আপনাদের সামনে এরকম একটি জঘন্য কাজের নমুনা উপস্থিত করতে পারি। এই সরকারের পুলিশ, ছাত্র পরিষদের পুলিশ যে

Saha, Kailashpati. "পশ্চিমবঙ্গের আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক অবস্থার প্রেক্ষিতে সমরেশ মজুমদারের উপন্যাস চতুষ্টয়"

কত নির্মম তার শিকার আমাদের এক ছাত্রবন্ধু, যিনি তার জীবনের অমূল্য একটি বছর হারিয়েছেন। কমরেড অনিমেষ, আপনাকে অনুরোধ করছি আপনি দয়া করে এগিয়ে আসুন।" [৬]

সুদীপ এসে হতবাক অনিমেষকে সামনে টেনে নিয়ে যায়। অনিমেষের সব প্রতিবাদ বিফল হয়ে যায়। সে বাধ্য হয় প্যান্টের ভাঁজ ফেলতে ফেলতে হাটুর উপরে তুলতে। গুলিবিদ্ধ তেলতেলে বীভৎস জঙ্ঘাটা সবাই দেখে। বিমান ভাষন চালিয়ে বলল-

"যারা গুলি করেছিল তারা জানে না বীভৎস চিহ্নটা আগামীকালের জন্য একজন সৈনিক তৈরি করে দিয়েছে।"[৭]

ইউনিভার্সিটির নির্বাচনে অনিমেষকে প্রথম সক্রিয় ভূমিকায় দেখা যায়। এর আগে অবশ্য বিমান ও সুদীপ তাকে কংগ্রেসি নির্যাতনের শিকার বলে ছাত্রদের কাছে পরিচয় করিয়ে দিয়েছে। ডায়াসে উঠে অনিমেষ স্বচ্ছন্দে তার রাজনৈতিক ভাবনার বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছে-

"আমি মফস্বলের ছেলে, জলপাইগুড়িতে কংগ্রেসের সমর্থক ছিলাম। সেখানে দেখেছি ক্ষমতার কী কদর্য প্রয়োগ, দেখেছি স্বার্থের কী নোংরা ব্যবহার। একটা বাড়ি তৈরি করতে গেলে যেমন নির্দিষ্ট প্ল্যান লাগে, একটা দেশকে গঠন করতেও তেমনি পরিকল্পনা প্রয়োজন। সেই পরিকল্পনা হল একটা নির্দিষ্ট মতবাদ যা দরিদ্রের মুখে অন্ন দেবে এবং একটা শ্রেণিহীন সমাজব্যবস্থার কথা বলবে।"[৮]

দলের হয়ে কাজ করার জন্য সুবাসদা বীরভূমে গিয়েছেন। অনিমেষকেও দলের কাজের জন্য গ্রামে যেতে হয়। সেখানে ভোট চাইতে গিয়ে তার অভিজ্ঞতা হয়েছে ভোটের বিরূপ-

"এ যেন তিন চারটে সাবানের কোম্পানী দরজায় দরজায় নিজের প্রোডাক্টের গুণাগুণ বলে বেড়াচ্ছে বিক্রি বাড়াবার জন্যে। যেসব প্রার্থী দলের হয়ে দাঁড়াচ্ছে তাদের সঙ্গে জনসাধারণের যোগ নেই।"[৯]

অনিমেষের মধ্যে ধীরে ধীরে রাজনৈতিক দলগুলির সম্পর্কে বিরূপতা জন্ম নেয়। অনিমেষ বুঝেছে যে পথে ভোটবাজ কমিউনিস্ট পার্টি হাঁটছে তাতে মুক্তি সম্ভব নয়। সুবাসদাও পার্টির কাজকর্ম আর মানতে পারছে না। আস্তে আস্তে অনীর মনে হতে লাগল- এদেশে রাজনীতিটা ফাঁকিবাজি ফক্কিকারি। দেশের মঙ্গলের কথা কেউ ভাবে না, কেবল পার্টির কথা। পার্টির ওপর তলার স্বার্থান্বেষী কিছু মানুষ সুবাসদাকে দল থেকে বহিষ্কার করে দেয়। অনিমেষও দল থেকে বেরিয়ে এসে ভিন্ন পথে দেশের হয়ে কাজ করার কথা ভাবে। অনিমেষ, সুবাসদা, মহাদেবদা যোগ দেয় নকশাল আন্দোলনে। শুরু হয় পুলিশের তাড়া খাওয়া অনিমেষের অস্থির জীবন। পুলিশী সন্ত্রাসে একের পর হত্যা করা হয় সুবাসদা, মহাদেবদাকে। আবার নকশালপন্থীদের খতম অভিযানকে সাধারণ মানুষ ভালো চোখে দেখেনি। ফলে সাধারণ মানুষের মধ্যে তৈরি হয় বিরূপ প্রতিক্রিয়া। অনিমেষ নিজেকে দেশকর্মী নকশাল পরিচয় দিয়েও সাধারণ মানুষের হাত থেকে রক্ষা পায়নি। তাদের অসহযোগিতায় অনিমেষ পুলিশের হাতে ধরা পড়েছে। এরপর শুরু হয় রাষ্ট্রের নগ্ন নির্লজ্জ অত্যাচার, বিচারহীন দীর্ঘ বন্দিজীবন। মাধবীলতাও পুলিশের অত্যাচার থেকে বাদ যায়না। তাকে নকশালদের গোপন তথ্য আদায়ের অবজেক্ট হিসেবে ব্যবহার করে পুলিশ শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন চালিয়েছে। অবশেষে ১৯৬৭ সালে পশ্চিমবঙ্গে যুক্তফ্রন্ট ক্ষমতায় এলে অনিমেষের মতো বন্দিরা মুক্তি পায়। পুলিশের অত্যাচারে অনিমেষ প্রায় খোঁড়া। দেশ গড়ার জন্য বিপ্লবের হতাশায় ডুবে যেতে যেতে অনিমেষ আবিষ্কার করে "বিপ্লবের আরেক নাম মাধবীলতা।" ক্রাচ বগলে নিয়ে অনিমেষ মাধবীলতার বাড়িতে আসে। তাদের ঠিকানা এখন বেলগাছিয়া ঈশ্বরপুকুর লেনের তিন নম্বর

বস্তি বাড়ি। মাধবীলতা এখন স্কুল মাস্টারনী। মাধবীলতার কাছে অনিমেষ তাদের পুত্র সন্তান অর্ক'র কথা জানল। বস্তির ঘরে এল একটি শিশু- অবিকল শিশু অনিমেষ। দীর্ঘ রাজনৈতিক পালাবদলের পর পিতা ও পুত্রের মধুর মিলনে 'কালবেলা' উপন্যাসের সমাপ্তি।

তিন

'কালপুরুষ' উপন্যাসের ভূমিকাতে লেখক জানিয়েছেন-

"কালবেলা'র নায়ক অনিমেষ আশা করেছিল তার পুত্র তার সমাজতান্ত্রিক আদর্শের নিশানটি শক্ত হাতে বহন করে নিয়ে চলবে। কিন্তু সমকালীন অন্তঃসারহীন কুটিল রাজনীতি এবং পঙ্কিল সমাজব্যবস্থা অর্ককে করে তুলেছিল অন্ধকার অসামাজিক রাজত্বের প্রতিনিধি। কিন্তু যেহেতু তার রক্তের মধ্যে ছিল অনিমেষের সুস্থ আদর্শবাদ এবং তার মা মাধবীলতার দৃঢ়তা ও পবিত্রতার সংমিশ্রিত উপাদান সেই হেতু তার বোধোদয় ঘটতে বিলম্ব হয়নি।"[১০]

'কালপুরুষ' উপন্যাসে লেখকের পরিণত জীবনভাবনা ও শিল্প সচেতনতা লক্ষ করা যায়। লেখক এই পর্বের সূচনায় জানিয়েছেন যে এটি রাজনৈতিক উপন্যাস নয়- ভালোবাসার উপন্যাস। এই ভালোবাসা হল নিজের প্রতি, মায়ের প্রতি এবং দেশমাতৃকার প্রতি। লেখক শেষপর্যন্ত জীবনকে রাজনীতির ঊর্ধ্বে স্থাপন করে মানবিক সম্পর্ক ও সামাজিক সম্পর্ক গুলিকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

'কালপুরুষ' উপন্যাসে উঠে এসেছে স্বামী ও স্ত্রীর সম্পর্ক, পিতা ও পুত্রের সম্পর্ক, পুত্র ও জননীর সম্পর্কের টানাপড়েন ও বিচার বিশ্লেষণ। এখানেই শেষ নয় আরো আছে- পরিচিত পরিবেশ ও সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্ক এবং সর্বক্ষেত্রে বিচিত্র রূপায়ণে যুক্ত হয়েছে সংঘর্ষ। সেই সংঘর্ষে স্বামী- স্ত্রী, পিতা-মাতা-পুত্র সকলের অন্তরে রক্তক্ষরণ ঘটেছে। সমালোচক অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় 'কালপুরুষ' উপন্যাসে সম্পর্ক গুলির বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে বলেছেন-

"প্রাত্যহিক মলিনতা ও একঘেয়েমির মধ্যে যখন সম্পর্ক- স্রোতে ভাঁটার টান ধরেছে, তখনই এক একটি অপ্রত্যাশিত ঘটনায় দূর হয়েছে মলিনতা, ভাস্বর হয়ে উঠেছে মানবিক সম্পর্কের চাপা পড়া মহিমা, যা পরস্পরকে কাছে টানে।"[১১]

'কালপুরুষ' উপন্যাসে লেখক ব্যক্তিজীবন, সমাজ ও পরিবেশকে স্পষ্ট করে দেখিয়েছেন। আমাদের চেনা ব্যক্তিজীবন ও সমাজজীবনকে ঈর্ষা, হিংসা, ইতরতা ও স্থূলতায় বিপর্যস্ত হতে দেখেছেন। এর পাশাপাশি ক্ষমতালোভী রাজনৈতিক নেতা ও হিংসাশ্রয়ী মস্তানবাহিনীদের স্পষ্ট করে তুলেছেন। উপন্যাসের শেষভাগে উঠে এসেছে কয়েকটি মৌলিক প্রশ্ন। আলোচ্য বিষয়ের প্রথম উপন্যাসটির নাম 'উত্তরাধিকার'। আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে- কিসের উত্তরাধিকার, কার উত্তরাধিকার। 'কালপুরুষ' উপন্যাসের শেষে অনিমেষ এই 'উত্তরাধিকার' শব্দটি নিয়ে নাড়াচাড়া করছিল। জলপাইগুড়িতে দাদু সরিৎশেখরের বাড়িতে বসে অনিমেষ ভাবছিল-

"কিছু রেখে গেলে তবেই পরের পুরুষ সেটি পায়। উত্তরাধিকার সূত্রে অর্জিত সম্পত্তি, স্থাবর কিংবা অস্থাবর, রক্ষা করাই কর্তব্য। কিন্তু আগের পুরুষ যদি কিছুই না রেখে যায়? যদি একটা বিরাট শূন্য ছাড়া অতীতের কাছ থেকে কিছুই না পাওয়া যায় তবে? এই বাড়ি- ঘর হয়তো খুব সাধারণ জিনিস। কিন্তু সরিৎশেখরের চারিত্রিক

দৃঢ়তা, একটা গোপন অনুচ্চার ভালোবাসা, মহীতোষের নীরব আত্মোৎসর্গ যা তিনি তার বাবার জন্য অকাতরে করে গেছেন, ছেলের জন্য প্রতিদান না চেয়ে নিঃশেষ হয়েছেন, সেগুলির মূল্য এর পরের পুরুষেরা জানবে না। কারণ অনিমেষরা এগুলির কিছুই ওদের দিয়ে যেতে পারবে না। অতএব অর্ক কোন অর্থেই কারো উত্তরাধিকারী নয়।" [১২]

অনিমেষ ও জুলিয়েন উত্তরবাংলার গ্রাম গঞ্জের দরিদ্র মানুষদের সমস্যাগুলি নিয়ে প্রথম কাজ শুরু করতে চেয়েছিল। উত্তরবাংলার চা বাগানের অধিকাংশ মানুষ বাঙালি নয়। এই দেশের মাটিতে তাদের একশো বছর আগে ধরে আনা হয়েছিল। এরা যেমন নিজেদের পশ্চিমবঙ্গের মানুষ বলে মনে করেনা, তেমনি তারা নিজেদের পুরানো বাসস্থানে ফিরে যেতে পারেনা। এদের মধ্যে তেমনভাবে শিক্ষা সম্প্রসারিত হয়নি। এরা চা বাগানের মালিকদের দ্বারা নানাভাবে শোষিত। এদের নিয়ে অনিমেষ ও জুলিয়েনরা গোপন বৈঠকে বসেছিল তিস্তার বাঁধ পেরিয়ে গভীর জঙ্গলে। এই আলোচনায় চা শ্রমিকদের সংগঠিত করে গোপনে জঙ্গি আন্দোলন গড়ে তোলার কর্মসূচি গৃহীত হয়।

অন্যদিকে বেলগাছিয়ার ঈশ্বরপুকুর লেনের তিন নম্বর বস্তির একটি ঘরে মানুষ হওয়া অর্কের সামনে কোন উজ্জ্বল আদর্শ নেই। তার মা মাধবীলতা স্কুলে পড়ান। খুব কষ্ট করে পঙ্গু স্বামী ও বখাটে সন্তানকে মানুষ করছেন। অথচ সেই ছেলে স্থানীয় মস্তান বাহিনীর একজন হয়ে দিন কাটায়। লেখাপড়া থেকে দূরে থাকে। পাড়ার মস্তানদের সঙ্গে যেমন তার ভাব ভালোবাসা আছে, তেমনি আছে ঘৃণা।

সমগ্র উপন্যাস জুড়ে একটি ছোট্ট পরিবারে অনিমেষ- মাধবীলতা- অর্কের সংকট ও সংগ্রাম উপস্থাপিত হয়েছে বৃহত্তর আর্থ- সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষিতে। সেই প্রেক্ষিতে কোথাও শান্তি নেই- আছে পদে পদে লড়াই, অশান্তি, হত্যা, হিংসা ও প্রতিহিংসা। এই রক্তক্ষয়ী উত্তাল পটভূমিকে লেখক সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন 'কালপুরুষ' উপন্যাসে। এই অস্থির ও ক্ষতবিক্ষত সময়ে ব্যক্তিমানুষ শান্তিতে বাঁচতে পারেননা- কারণ সে বড় সুখের সময় নয়।

রাজনৈতিক দলগুলির কর্মসূচিতে যেমন এলাকা দখলের লড়াই আছে; তেমনি আছে দলের মদতে থাকা মস্তানবাহিনীর পারস্পারিক তীব্র হিংসা ও লড়াই। মাধবীলতা শত চেষ্টাতেও অর্ককে এই মস্তানচক্রের আওতার বাইরে আনতে পারেনি। বেলগাছিয়ার ঈশ্বরপুকুর লেনের বস্তির ছেলে মেয়েরা কেউ মস্তানচক্রের বাইরে যেতে পারেনা। তাই ছেলেগুলি হয়ে ওঠে মস্তান ও তোলাবাজ। দোকান ও ধনীর বাড়িতে হামলা, পারস্পারিক ছুরি, বোমা, পিস্তলের অবাধ ব্যবহার কলকাতার পাড়াগুলিকে সদা সন্ত্রস্ত রাখে। নিজ পাড়ার এলাকায় এই মস্তানদের দৌরাত্ম, পুলিশের অনৈতিক সমর্থন, টাকা আদায়ের নানা ফন্দি- সব মিলে মিশে একাকার হয়ে যায়।

অর্ককে নিয়ে অনিমেষ ও মাধবীলতার মধ্যে মনোমালিন্য দেখা দেয়। মাধবীলতার কাছে সে ক্রমশ কর্মহীন বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। অনিমেষেরও একসময় মনে হয়-

"আমি শালগ্রামশিলা। কি আশ্চর্য। আমি সেই অনিমেষ মিত্র- যে উত্তাল আন্দোলনে একসময় সামিল হয়েছিল, সে নেহাতই জরভরত। ... এখন সে প্রকৃত অর্থে দায় ছাড়া কিছু নয়।"[১৩]

'কালপুরুষ' উপন্যাসের শেষাংশে প্রাধান্য পেয়েছে দুটি বিষয়- এক, অনিমেষ আর মাধবীলতার সম্পর্কের ভাঙন ও তার মেরামতি; দুই, বেলগাছিয়ার ঈশ্বরপুকুর লেনে তিন নম্বর বস্তিবাসীদের দ্বারা মস্তানদের দৌরাত্মের প্রতিরোধ ও যৌথ জীবনযাত্রার মাধ্যমে শুভ মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম।

জলপাইগুড়িতে ফিরে আসার পর অনিমেষ ও মাধবীলতার সম্পর্কের ব্যবধান স্পষ্ট হয়। অনির বাবার মৃত্যুর পর অসহায় পিসিমা হেমলতা ও ছোট মা'র জন্য অনিমেষ জলপাইগুড়িতেই থেকে গিয়ে তাদের দেখাশোনার করার পাশাপাশি গোপন জঙ্গি আন্দোলনে অংশ নেবার সিদ্ধান্ত নেয়। অনিমেষের এই সিদ্ধান্তে মাধবীলতা আপত্তি জানায়। স্কুলের চাকরিতে ছুটি মিলবে না- এই অজুহাতে মাধবীলতার কলকাতা ফিরে যাওয়ার নেপথ্যে ছিল ছোট মা ও পিসিমার জন্য অনিমেষের থেকে যাবার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে তার প্রতিবাদ এবং সেই সূত্রে তাদের আইনসম্মত ও শাস্ত্রসম্মত বিবাহ না ঘটার ফলে সমাজের চোখে অর্কর বেজন্মায় পরিণতি।

এদিকে কলকাতার ঈশ্বরপুকুর লেনে বস্তিবাসীদের জীবনযাত্রা দ্রুত বদলে যাচ্ছে। গুণ্ডা মস্তানদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ অর্কদের পাড়া। আর রাজনৈতিক দলের প্রয়োজনে গুণ্ডা মস্তানদের আশ্রয়দান ও তাদের দ্বারা প্রতিপক্ষকে দমিয়ে দেবার প্রয়াস। এই দুই পক্ষ- গুণ্ডা মস্তান ও রাজনৈতিক দলের যৌথ চাপে অতিষ্ঠ হয়ে হয়ে সাধারণ মানুষ একত্রিত হয়ে ঈশ্বরপুকুর লেন বস্তি থেকে মস্তান ও রাজনৈতিক নেতাদের হটিয়ে দিতে সক্ষম হয়। এই আন্দোলনে ঈশ্বরপুকুর লেনের তিন নম্বর বস্তির সব নরনারী যুবক- যুবতী হাতে হাত মেলাল এবং অর্ক হয়ে উঠল তাদের নেতা। তারা সমবেতভাবে মস্তানদের বিতাড়িত করে ধূর্ত ধনীদের শিক্ষা দিতে চাইল এবং সকলে মিলে যৌথ পরিবার এবং যৌথভাবে রন্ধন ও আহারের ব্যবস্থা করে সমাজে একটা নতুন শৃঙ্খলা আনতে চাইল। গঠিত হল শান্তি কমিটি। অর্ককে মাঝখানে রেখে অনিমেষ ও মাধবীলতার মানসিক ব্যবধান দূর হয়ে গেল। কিন্তু এখানেই শেষ নয় লেখক জানিয়েছেন-

"কিন্তু মস্তানরা শেষ হয়ে যায় নি। পাড়া দখলের জন্য গুণ্ডামি খুন শেষ হয় না, তার সবথেকে বড় কারণ তাদের পিছনে অশুভ শক্তি, যা আসে রাজনৈতিক দাদাদের মাধ্যমে। তাই অর্ক ফের গুণ্ডাদের শিকার হয়। তাকে পুলিশ হাজতে যেতে হয়। মাধবীলতা ছেলের সঙ্গে দেখা করে বলেন, 'অর্ক মানে সূর্য, তাকে কেউ বন্দি করতে পারে না।"[১৪]

মাধবীলতার এই বিশ্বাসে উপন্যাসের পরিসমাপ্তি।

চার

এরপর দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে সংবাদপত্রে সাপ্তাহিক কিস্তিতে প্রকাশ পায় অনিমেষ সিরিজের চতুর্থ এবং আপাতত শেষ উপন্যাস 'মৌষলকাল'। শুরুর দিকে সমরেশ মজুমদার এক জায়গায় লিখেছেন "এক শতাব্দী থেকে আর এক শতাব্দীর দিকে চলেছে দেশ।" অর্থাৎ সময়টা ১৯৯৯ থেকে ২০০১ সাল হওয়া স্বাভাবিক। এই সময় রাজ্যে চতুর্থ বামফ্রন্ট সরকারের ঘুণ ধরা অবস্থা ক্রমশ উঠে আসছে। এর ঠিক পরে চতুর্থ বারের জন্য সরকার গঠন করে বামফ্রন্ট সরকার। নির্বাচনের সময় দেওয়া প্রতিশ্রুতি মতো বামফ্রন্ট সরকার শিল্পায়নের পথে এগোতে গেলে প্রবল বিরোধিতার সম্মুখীন হয়। 'মৌষলকাল' উপন্যাসের কাহিনিতে উঠে এসেছে সিঙ্গুর-

নন্দীগ্রামের প্রসঙ্গ। এর পাশাপাশি অনিমেষ- মাধবীলতার স্মৃতিচারনায় উঠে এসেছে সত্তরের অগ্নিগর্ভ দিনগুলির কথা।

বামফ্রন্ট সরকারের শেষদিকে মাওবাদী কমিউনস্ট পার্টির উত্থান এবং তাদের গোপন ঘাঁটি গুলি থেকে পরিচালিত জনযুদ্ধকে মিলিয়ে দিয়ে গড়ে ওঠা নতুন রাজনৈতিক দলের গোপন কার্যকলাপ ও তাদের গতিবিধি সযত্নে ধরা পড়েছে 'মৌষলকাল' উপন্যাসে। অনিমেষ- মাধবীলতার একমাত্র সন্তান অর্ক ঘটনাক্রমে জড়িয়ে যায় মাওবাদী আন্দোলনে। গ্রাম গঞ্জে দমবন্ধ করা সন্ত্রাস উঠে আসে তৎকালীন শাসকদলের বদান্যতায়। কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক ভারত রক্ষা আইনে মাওবাদী কমিউনিস্ট পার্টিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার কেন্দ্রের এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে এবং মতাদর্শগত ভিন্নতার জন্য মাওবাদীদের সঙ্গে জনসাধারণের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয়।

২০০৪ সালে বামপন্থীরা ইউ পি এ সরকারকে সমর্থনের যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, পারমানবিক চুক্তির বিরোধিতায় তাঁরা সেই সমর্থন তুলে নেয়। এরপর ২০০৯ সালে লোকসভা নির্বাচনে বিরোধী দল তৃণমূল কংগ্রেস কিছুটা লাভের মুখ দেখে। অন্যদিকে কংগ্রেস কেন্দ্রে নিজেদের শাসনক্ষমতাকে টিকিয়ে রাখতে সক্ষম হয়। এই পরিস্থিতিতে সিঙ্গুর, নন্দীগ্রাম, নেতাই কাণ্ড বামফ্রন্টের দীর্ঘ রাজনীতিতে ফাটল ধরিয়ে দেয়- আর সেই পথ দিয়ে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে উঠে আসে সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস। দীর্ঘ চৌত্রিশ বছর ক্ষমতার অলিন্দে থাকা বামফ্রন্ট সরকারের ত্রুটি বিচ্যুতি জনমানসে ক্ষোভ ও বিরক্তির কারণ হয়ে ওঠে। বাংলা রাজনীতির এই পালাবদলের ধরা পড়েছে 'মৌষলকাল' উপন্যাসে। বাড়িওয়ালা- ভাড়াটে বিবাদে পার্টির অহেতুক দালালি, জনগণকে কাছে টানতে পার্টির দেবগৃহ নির্মানের মতো আদর্শহীনতা, প্রশাসনকে নির্লজ্জভাবে দলদাস হিসেবে ব্যবহার, নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের দালালি, কৃষিজমি অধিগ্রহণ- এই কালপর্বে জুড়ে আছে যাবতীয় দোষাদোষের প্রায় সবটুকু।

অনিমেষ, মাধবীলতা, অর্ককে নিয়ে একটি পরিবারের প্রাত্যহিকতা ও তাদের উত্থান পতনে বড় বেশি ক্রিয়াশীল হয়ে উঠেছে রাষ্ট্র। যে রাষ্টের শোষণ থেকে একদিন মুক্তির লড়াইয়ে ঘর ছেড়েছিল অনিমেষ- কালের সেই অমোঘ নিয়মে অর্কও সেই পথের পথিক। অনিমেষদের চোখে একসময় দুনিয়ার যে ক্রমমুক্তির স্বপ্ন ছিল, বর্তমান বিশ্বায়নের প্রভাবে সেখানে আজ ভোগবাদী সভ্যতার বাড়বাড়ন্ত।

ক্ষমতার মেদ রাজনৈতিক নেতাদের অন্ধ করে দেয়। ক্ষমতার অলিন্দে বসে তখন তাঁর আচরণ হয়ে যায় ডিক্টেটারের মতো। তিনি যা ইচ্ছে তাই করতে পারেন, যা খুশি তাই বলতে পারেন। স্বাধীনতা পরবর্তী আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক বিবর্তনে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পেয়েছে সাধারণ মানুষের প্রতিবাদ। মানুষকে বাদ দিয়ে কোন সরকার ক্ষমতায় আসতে পারে না। বর্তমান সরকারের জনকল্যাণমুখী কাজ যেমন জনসাধারণকে উজ্জীবিত করছে, তেমনি কিছু স্বার্থান্বেষী আমলাতন্ত্রের বাড়বাড়ন্তে তাদের নীচের তলায় একটু একটু করে মেদ জমছে না তো? তাই সাধারণ মানুষের ভিত্তিভূমিতে নির্মিত সরকারের রাষ্ট্র সিংহাসনের মাটির তলার উইপোকাগুলিকে সরানো দরকার। কারণ সেখানে মানুষই শেষ কথা বলে।

তথ্যসূত্রঃ

১ সমরেশ মজুমদার, উত্তরাধিকার, মিত্র ও ঘোষ, জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৬, পৃ. ৩৯

২ তদেব পৃ. ৬৪

৩ তদেব পৃ. ২৪৭

৪ সমরেশ মজুমদার, গীতবিতান ছুঁয়ে বলছি, প্রথম খণ্ড, সাহিত্যম, জানুয়ারি ২০১৪, পৃ. ১০৬

৫ সমরেশ মজুমদার, কালবেলা, আনন্দ পাবলিশার্স, বৈশাখ ১৩৯০, পৃ. ৪২

৬ তদেব, পৃ. ৫৩

৭ তদেব, পৃ. ১২৬

৮ কালবেলা পৃ. ১৬৪

৯ কালবেলা পৃ. ১৯৭

১০ সমরেশ মজুমদার, কালপুরুষ, আনন্দ পাবলিশার্স, প্রথম প্রকাশ ১৯৮৫, ভূমিকা অংশ

১১ অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, বাংলা উপন্যাসে ট্রিলজি, দে'জ,২০০৭, পৃ. ১৯৫

১২ কালপুরুষ, পৃ. ৩৬৯

১৩ কালপুরুষ, পৃ. ৬৬

১৪ কালপুরুষ, পৃ. ৪৩২